দার্জিলিং শহর গঠনে বাঙালিদের অবদান

আনন্দগোপাল ঘোষ

পাহাড়ের রানি ও অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে দার্জিলিং নামে একটি গ্রামের রূপান্তরের কাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর। দার্জিলিং জেলা গেজেটিয়ার প্রণেতা L.S.S.O. Malley (১৯০৭ সালে) লিখেছেন ১৩৮ বর্গমাইল দার্জিলিং অঞ্চলে ১০০ জন লেপচা বাস করত। লেপচা ভাষায় মৌখিক তথ্য থেকেও এই একই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্যের মধ্যে বর্তমান দার্জিলিংকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দার্জিলিং -এর এই রূপান্তরের পশ্চাতে বাঙালিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা বর্তমান নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

ইংরেজ কোম্পানী ১৮৩৫ সালে সিকিমের মহারাজার নিকট থেকে দার্জিলিং অঞ্চলটি পেয়েছিল। দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল পেয়ে ইংরেজ কোম্পানি কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছিল। তার প্রধান কারণ হল, দার্জিলিং -এ জলবায়ু ও পাহাড়ি পরিবেশ। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ইংরেজ বণিকরা কলকাতা - মাদ্রাজ - মহীশূরের গরম আবহাওয়ায় ক্লান্তিবোধ করা শুরু করেছিলেন। তাই ইংরেজ বণিকরা খুঁজছিলেন পাহাড়ি পরিবেশের একটি জায়গা যা কিনা তাঁদের শীতের দেশের আবহাওয়া সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যযুক্ত হবে। দার্জিলিং অঞ্চলটি সেদিক থেকে যথোপযুক্ত ছিল। তাই দেখা যায় ১৮৩৫ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক ইউরোপীয় পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য দার্জিলিং-এ বাড়িঘর তৈরি করেছিলেন। এই সংখ্যা অবশ্য পরবর্তীকালে বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা ভালো, যে আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সিমলা - শিলং-এর জন্ম হয়নি। স্বভাবতই শুধু ইংরেজ নয়, শীতপ্রধান ইউরোপীয় মহাদেশের বণিকরাই (যাঁরা ভারতে বাণিজ্য করতেন) তখন দার্জিলিংকে তাঁদের স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন।

একটা বিষয় পরিষ্কার হল যে, দার্জিলিং তথা পার্বত্য অঞ্চলে আদিপর্বে কোনো নেপালির বাস ছিল না। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে যাঁরা কর্মসূত্রে দার্জিলিং-এ এসেছিলেন তাঁরা বাঙালি। ভারতের সর্বত্র যেমন ইংরেজের সংগে বাঙালি তল্পিবাহক হিসাবে গিয়েছেন, তেমন দার্জিলিং -এও। একটা খসড়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দার্জিলিং শহরের লোকসংখ্যা ১৮৪৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০,০০০। এরা কারা? নেপালি নয়। কারণ, নেপালিদের আগমন দার্জিলিং অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল ১৮৫৪ সালে চা - বাগান খোলার পরে এবং আরো পরে নেপালিদের আগমন বেড়ে গিয়েছিল সামরিক বাহিনীর কর্মসূত্রে ও নানা উন্নয়নমূলক কর্মের সূত্রে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের অধিকাংশ নেপালিই দার্জিলিং অঞ্চলে থেকে গিয়েছেন, নেপালে ফিরে যাননি। অন্যদিকে, অদূরদর্শী বাঙালি দার্জিলিং -এ স্থায়ীভাবে থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। সম্ভবত কিছুটা পরিবেশগত কারণেও। বাঙালি যদি নেপালিদের মতো দার্জিলিং -এ তখন স্থায়ীভাবে থাকার কথা ভাবতেন, তাহলে দার্জিলিং -এর জন-বিন্যাসের চেহারা বোধহয় আজ অন্যরূপ নিত। অবশ্য যা হয়নি, তা নিয়ে খেদ করে লাভ নেই। তবে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

প্রথমে বর্ধমানের মহারাজদের কথায় আসা যাক। গেজেটিয়ার প্রণেতা A.J. Dash (1947 সাল) লিখেছেন, 'About 1850, the Maharaja acquired properties in the station of Derjeeling and Kurseong...।' এই মহারাজার নাম প্রতাপচাঁদ মহতাব। প্রকৃতপক্ষে প্রতাপচাঁদ দার্জিলিং - কার্শিয়াং -এ ১৬০০ একর জমি কিনেছিলেন। যার মধ্যে ছিল বন, চা - বাগান, আবাসিক ভবন, দোকান - বাজার ও কৃষিজমি। দার্জিলিং-এ বর্ধমান মহারাজার বাড়ির নাম 'রোজ ব্যাংক'। এ বাড়িটি দার্জিলিং -এর রাজভবনের মতনই নীল গম্বুজযুক্ত। এ সম্পর্কেও একটি গল্প চালু আছে দার্জিলিং-এ। সেটা হল বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মনে করতেন তিনি গভর্নরের চেয়ে কম কীসে।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর বিজয়চাঁদ মহতাব রাজা হন। দার্জিলিং শহরের সামাজিক - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মহারাজার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বহু শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জমি ও অর্থদান করেছিলেন। দার্জিলিং মহারানি গার্লস স্কুল স্থাপনে বর্ধমানের মহারানির বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের পুত্র উদয়চাঁদ মহতাব ছিলেন নেপালি সম্প্রদায়ের অতি আপনজন। নেপালিদের অন্যতম সামাজিক সংস্থা গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন উদয়চাঁদ মহতাব। দুঃস্থ গোর্খাদের দুঃখ নিবারক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন উদয়চাঁদ মহতাব। দুস্থ গোর্খাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া ছিল এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং -এর গঠনে বর্ধমান রাজপরিবারের অবদান সম্পর্কে A.J. Dash লিখেছেন, 'Maharajas of Burdwan have always associated themselves with local social. religious and educational activities and have made regular grants in support of a number of instiutions.'

বর্ধমানের পরে দার্জিলিং -এর জমি বাড়ি কিনেছিলেন বঙ্গদেশের একমাত্র দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের রাজপরিবার। দার্জিলিং -এ কোচবিহারের মহারারাজ ১৭টি বাড়ি এবং ৭৫ একর জমি কিনেছিলেন। অবশ্য শহর এলাকায় এ সব বাড়ি মহারাজাদের বসবাসের জন্য শহরের দক্ষিণাংশে অকল্যান্ড রোডের উপর 'কলিনটন' নামে একটি প্রাসাদোপম ভবন তৈরি করা হয়েছিল। এ ভবনটির বর্তমান বয়স একশো বছরের বেশি। দার্জিলিং -এর দর্শনীয় ভবনের মধ্যে এটি একটি। এছাড়া 'হার্মিটেজ' ও 'উকিলভিলা' নামে দুটি বাড়িও রাজপরিবারের লোকজনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সাধারণত গ্রীষ্মকালে মহারাজারা সপরিবারে দার্জিলিং-এ থাকতেন। মহারানি গায়ত্রী দেবী (কোচবিহারের রাজকুমারী) তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'The Princess Remembers'-এ লিখেছেন,' ... I far preferred Darjeeling... where we began to spent our Summer from the time... I was about twelve or thirteen.'

আধুনিক দার্জিলিং শহরের সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনে কোচবিহারের রাজপরিবারের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শহরের উন্নয়নের সিংহভাগই কোচবিহারের রাজপরিবারের। প্রথমেই গভর্নর হাউস বা রাজভবনের কথা উল্লেখ করতে হয়। বার্চহিলের সুদৃশ্য গর্ভর্নর হাউসটি কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দানের জমিতে তৈরি। দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। জিমখানা ক্লাবের টেবিল টেনিস কোর্ট তৈরি, রেসের জন্য কাপ উপহারের টাকা এবং পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য টেনিশ কোর্ট তৈরি, রেসের জন্য কাপ উপহারের টাকা এবং পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য টাকাও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ দিতেন।

আধুনিক দার্জিলিং শহরের সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনে কোচবিহারের রাজপরিবারের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শহরের উন্নয়নের সিংহভাগই কোচবিহারের রাজপরিবারের। প্রথমেই গভর্নর হাউস বা রাজভবনের কথা উল্লেখ করতে হয়। বার্চহিলের

সুদৃস্য গভর্নর হাউসটি কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের দানের জামিতে তৈরি। দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। জিমখানা ক্লাবের টেবিল টেনিস কোর্ট তৈরি, রেসের জন্য কাপ উপহারের টাকা এবং পুষ্প প্রদর্শনীর জন্য টাকাও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ দিতেন।

দার্জিলিং -এর ব্রাহ্ম সমাজের নতুন ভবন তৈরির জন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মহারানি গার্লস স্কুল স্থাপনে মহারানি সুনীতি দেবী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

দার্জিলিং -এর সুপ্রসিদ্ধ লুইস জুবিলি স্যানাটেরিয়ামের জন্য মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ জমি ও বাড়ি দান করেছিলেন। পৌরসভার টাউন হল নির্মাণকল্পে মহারাজা ১,২৫,০০০ টাকা দান করেছিলেন। পৌরসভার জলের ট্যাংক স্থাপনের জন জমি দান করেছিলেন। দার্জিলিং -এর বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের জন্য হিন্দু পাবলিক হল নির্মাণেও অর্থ দান করেছিলেন। পরে ভবনটির নাম পরিবর্তন করে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক হল রাখা হয়েছে। লালকুঠি নামক যে বাড়িতে সুভাষ ঘিসিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের প্রশাসনিক দপ্তর গড়ে তুলেছিলেন, সেটিও কোচবিহারের মহারাজাদেরই আবাসস্থল ছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক দার্জিলিং শহর গঠনের পশ্চাতে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ -এর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। দার্জিলিং -এর সর্বপ্রকার শীর্ষস্থানীয় অনুষ্ঠানের বরেণ্য অতিথি ছিলেন মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানি সুনীতি দেবী। কোচবিহারের রাজপরিবারের অবদান সম্পর্কে A.J. Dash লিখেছেন,'Not only have they extensive property in Darjeeling, but the rulers of Coochbehar have made frequent visits. Sometimes Prolonged and have often taken prominent part in the summer life of the town.'

বর্তমান ও কোচবিহার রাজপরিবার ছাড়াও বঙ্গদেশের আরও বহু রাজা - জমিদার দার্জিলিং -এর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রংপুরের তাজহাটের জমিদার মহারাজ গোবিন্দলাল রায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়াম তৈরির জন্য ৯০,০০০ টাকা দান করেছিলেন রাজশাহী বিভাগের কমিশার Edmund Elliot Louis -কে। এর নামেই স্যানাটোরিয়ামের নামকরণ করা হয়েছিল। তাজহাটের মহারাজার দার্জিলিং -এ বাড়ি ছিল।

রাজশাহির অন্যতম জামিদার দিঘাপতিয়ার জমিদারদের দার্জিলিং-এ দুটি বাড়ি ছিল। একটি নর্থ হিলে অপরটি জলদাপাহাড়ে। দ্বিতীয়টির নাম 'গিরিবিলাস'। এটি এখন সরকারি পর্যটন নিবাস। দার্জিলিং -এর শ্মশান নির্মাণে দ্বিাপতিয়ার জমিদাররা প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

বর্তমানের চকদিঘির রাজা মণিলাল সিংহ রায়ও লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়াম তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। দার্জিলিং -এ এদের একটি বাড়ি ছিল। এছাড়া দার্জিলিং শহরে বাড়ি ছিল সন্তোষের জমিদার, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরির, নদিয়ার মহারাজা ক্ষৌণিশ চন্দ্রের, পুঁটিয়ার জমিদার প্রমদানাথ রায়ের এবং সর্বোপরি ত্রিপুরার মহারাজাদের।

মহারাজা - রাজা - জমিদার ছাড়াও উনিশ শতকের বাঙালি আইনজীবী, চিকিৎসক, কবি - সাহিত্যিকরাও নানাভাবে দার্জিলিং শহরের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এদেরে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আচার্য বসু ও স্যার যদুনাথ সরকারের দ্বিতীয় আবাসস্থল ছিল দার্জিলিং -এ। আচার্য বসু দার্জিলিং -এ একটি গবেষণাগার খুলেছিলেন কলকাতার শাখা হিসেবেই। দিবাকর সেনের 'ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার জনক জগদীশচন্দ্র' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। স্যার যদুনাথ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরে দার্জিলিং-এ বাড়ি কিনে একটানা দশ বছর বাস করেছিলেন। স্যার যদুনাথের বিশ্বখ্যাত গবেষণার ফসল এই দার্জিলিঙেই তৈরি হয়েছিল। আচার্য বসু ও স্যার যদুনাথ দুজনেই পার্বত্য আদিবাসীদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। নেপালি সাহিত্য সম্মেলন যখন নেপালি বীর বীরভদ্র ও অমর সিং থাপার (ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন) জীবনী প্রকাশ করেছিল তাঁর ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য বসু ও স্যার যদুনাথ।

যে মহীয়সী মহিলার নাম না-উল্লেখ করে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে, তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী-তনয়া হেমলতা সরকার। দার্জিলিং -এর সকল প্রকার সামাজিক - সাংস্কৃতিক জনসেবামূলক কাজে যাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। মহারানি গার্লস স্কুলের স্থাপয়িতা এবং প্রধান শিক্ষিকা হেমলতা সরকার দার্জিলিং পৌরসভার সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। বঙ্গাদেশের প্রথম মহিলা পৌরকমিশনার। লীলা মজুমদারের 'আর কোনখানে' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'যখন ছোটো ছিলাম' গ্রন্থে আরও বহু মনীষীর স্মৃতিকথা হেমলতা সরকারের কথা পাওয়া যায়। হেমলতার স্বামী বিপিনবিহারী সরকার পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পাহাড়বাসীর বিশেষ প্রিয় ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ডা. সরকার নেপালের মহারাজার চিকিৎসক ছিলেন। সে সময় হেমলতা সরকার 'নেপালে বঙ্গনারী' নামে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী পত্রিকায় লিখেছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আজকের দার্জিলিং শহরের উন্নতির পিছনে নেপালী বাঙালিদের সাবিক ভূমিকা ছিল। এই অতি সত্যি কথাটা আমাদেরই রাজ্যের অধিবাসী নেপালী ভাইদের একাংশ ভুলতে বসেছেন। অবশ্য আমরা নিজেরাও আমাদের পূর্বপুরুষের অবদানের কথা ভুলে গেছি। এসব বিষয়গুলো নেপাল সমাজের এই প্রজন্মের তরুণদের নিশ্চয়ই অজানাই রয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারি ব্যর্থতার চেয়ে বৌদ্ধিক সমাজের ব্যর্থতাই বিশেষভাবে দায়ী। কলকাতা মহানগরীর বৌদ্ধিক কথা ধরছি না। কারণ তাঁদের কাছে দার্জিলিং পর্যটনের একটি স্থান মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধিক সমাজের নিকট দার্জিলিং শুধু পর্যটন কেন্দ্র নয়, উত্তরবঙ্গে উত্তরাংশের বৃহত্তর জনজীবনের অংশ বিশেষ। আজ ৪৭ বছর ধরে অসংখ্য নেপালি, ভুটিয়া, লেপচা, তিব্বতি ছাত্র-চাত্রীরা উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসে থেকে। তাঁদের - আমাদের অন্তরঙ্গতার কথা সুবিদিত। অথচ এসব আমরা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করিনি। পাহাড়িদের যে অংশ আলাদা হতে চাইছেন তার পিছনে যুক্তি ও ইতিহাসের সমর্থন নেই বললেই চলে। একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা এরা বলেছেন, তা ইতিহাসগতভাবে সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু সেটি যে মিথ্যা, তাও তো বৌদ্ধিক সমাজ বলতে এগিয়ে আসছেন না? ডিকেন্সের ভাষায় বলতেই পারি, '...It is the worst of time...'।

———————————

আনন্দ গোপাল ঘোষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। নিবন্ধটি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে'র সৌজন্যে প্রকাশিত।